চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যধারায় কাহিনীমূলক কবিতার আঙ্গিক বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যধারায় কাহিনীমূলক কবিতার আঙ্গিক বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীমূলক কবিতার আঙ্গিক বিশ্লেষণের সূচনাপর্বেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কবির রচিত অন্যান্য কাব্যে বিধৃত কবিতাগুলির পাশাপাশি কাহিনীমূলক কবিতাগুলিকে রেখে বিচার করলে স্বভাবতই কাহিনীমূলক কবিতাগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্বাতন্ত্র্য ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। তাই কাহিনীমূলক কবিতাগুলির আঙ্গিক অন্যান্য কবিতাগুলির থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্ববর্তী দু'টি অধ্যায়ে রবীন্দ্র-সৃষ্ট যে সব কাহিনীমূলক কবিতার বিষয়বস্তুর সুগভীর আলোচনা করা হয়েছে সেই সূত্র ধরেই পূর্বোক্ত কাব্যগুলিতে বিধৃত কাহিনীকবিতাগুলির আঙ্গিক সম্পর্কে এই আলোচনা করা হচ্ছে।

কিশোর কবি তাঁর কবিজীবনের উষালগ্নে বেশ কতকগুলি আখ্যানকাব্য ও খণ্ড কবিতা রচনা করেছিলেন। লুপ্ত 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' কাব্যকেই কবির কবিতা কর্মের প্রথম প্রকাশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তবে কাব্যটি লুপ্ত হওয়ার কারণে এর আঙ্গিক সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে 'জীবন স্মৃতি'তে এই কাব্যটিকে স্বয়ং কবিগুরু 'বীর রসাত্মক কাব্য' বলে বর্ণনা করেছেন। ''বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম ..... তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীর রসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম।'' (জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪১)

লুপ্ত 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' কাব্যটির পর 'বনফুল' কাব্যটি আলোচনার দাবি রাখে। এটি যেন কবিতার আকারে উপন্যাস। আদ্যন্ত রয়েছে মিত্রাক্ষর ছন্দ। এক্ষেত্রে আঙ্গিক আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর একটা বিশেষ লক্ষণের প্রতি আলোকপাত করা অত্যন্ত জরুরি। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, এ সময় কবিমনের অন্তঃপুরে কবি হওয়ার সাধনা চলছিল বটে, কিন্তু কবিতা সৃষ্টির এই প্রাথমিক অধ্যায়ে অর্থাৎ কবি-জীবনের একেবারে গোড়ার দিকের রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরী কবিদের অর্থাৎ কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখের অনুসরণে আখ্যানকাব্য বা গাথাকাব্য রচনা করতে চেষ্টা করেছেন। 'বনফুল'-এর কাহিনীর সঙ্গে কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র সাদৃশ্য রয়েছে আবার এর গঠনশৈলীতে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনাশৈলীর প্রভাব অনুমিত হয়। অষ্টম সর্গে বিহারীলালের স্তবক গঠনরীতি ও তৃতীয় সর্গে তিন মাত্রার ছন্দের অনুসরণ রয়েছে। সপ্তম সর্গে শ্মশানের বর্ণনায় খানিকটা হেমচন্দ্রের 'ছায়াময়ী' (১৫ জানুয়ারী, ১৮৮০ সাল) কাব্যের ছায়াপাত ঘটেছে আবার অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের ভাব, ভাষা এবং চিত্রকল্পও 'বনফুল' কাব্যে দুর্নীরিক্ষ নয়।

'বনফুল' রচনার দুই বৎসর পর রচিত 'কবি কাহিনী' কাব্যে কিশোর কবির খানিকটা নিজস্বতা ফুটিয়ে

তোলার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যটিও 'বনফুল'-এর মত ট্র্যাজিক রোমান্স। কবির স্বকীয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হল এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যজীবনে যে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বজীবন একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল তারই পূর্বাভাস রয়েছে এই 'কবিকাহিনী'তে। কাব্যটি অমিত্রাক্ষর পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত।

এই কথাগুলি যেন   পড়িল বালিকা ধীরে ---
    "কত ভালোবাসি বালা কহিব কেমনে!
তুমিও সদয় হয়ে   আমার সে প্রণয়ের
    প্রতিদান দিয়ো বালা এই ভিক্ষা চাই"

....

স্কন্ধে তার রাখি মাথা   কহিল কম্পিত স্বরে,
    "আমিও তোমারে কীগো বাসি না কি ভালো?"

('কবিকাহিনী', ২য় সর্গ)

এভাবেই কবি সৃষ্টি করেছেন রোমান্স।

তবে পূর্বের কাব্যটির মতো এতে নাটকীয়তা নেই। কিন্তু 'বনফুল' বা 'কবিকাহিনী' কাব্যের ভাব, ছন্দ, প্লট ইত্যাদিতে পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণ করার প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও একথা ঠিক যে, কাব্যদুটিতে কবির যে লিরিক প্রতিভা ও কল্পনার অবাধ বিস্তার লক্ষ করা যায়, তা উত্তর-জীবনের রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলিকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

এরপর কবি 'রুদ্রচণ্ড' ও 'ভগ্নহৃদয়' নামে দু'টি কাব্য রচনা করেন। তবে দু'টিকেই নাট্যগুণসম্পন্ন কাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না। উভয় কাব্যেই পাত্রপাত্রীদের সংলাপের মাধ্যমে কবিতায় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে

মুরলা ।   কবি গো, ও-সব কথা ভেবো নাকো আর,
            শ্রান্ত মাথা রাখ এই কোলেতে আমার।
কবি ।   সখি, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন,
            হাহা করে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লয়ে।

(ভগ্নহৃদয়, ১ম সর্গ)

তবে এক্ষেত্রেও রয়েছে কবি-সৃষ্ট এ পর্যায়ের কাব্যগুলিতে অনুসৃত বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য --- ট্র্যাজিক রোমান্সধর্মিতা।

এ পর্যন্ত যে সমস্ত কাব্যগুলির কথা আলোচিত হল তাদের প্রত্যেকটিতেই লক্ষ করা যায় যে কাহিনীর

নায়ক স্বয়ং কবি। কাহিনীর সঙ্গে কবি নিজে একাত্ম হয়ে গেছেন। স্বভাবতই কাব্যগুলিতে এক আবেগময় সুরের অব্যাহত গতি ও মুক্তপক্ষ কল্পনার সঞ্চার লক্ষ্য করা যায়। 'ভানুসিংহ-ঠাকুরের পদাবলী' কবির কিশোর বয়সের রচনা হলেও আঙ্গিকের দিক থেকে এর এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কবি বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুকরণে ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে সমস্ত কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলির মাধ্যমেও টুকরো টুকরো গল্পবীজের আভাস দিয়েছেন পাঠককে। অন্ত্যমিলযুক্ত পংক্তিতে কবিতাগুলি রচিত। কৈশোরক পর্বে রচিত বেশ কিছু-গাথা, গান, গীতিকবিতা পরবর্তীকালে (১২৯১ সাল) 'শৈশবসঙ্গীত'-এ সংকলিত হয়েছিল। পূর্বের কাব্যগুলিতে যে ধরনের আবেগ, উচ্ছ্বাস, লিরিক ধর্ম এবং পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণে কাব্য রচনার প্রবণতা ছিল, সেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল 'শৈশব সঙ্গীত'-এর কবিতাগুলিতে। তবে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কবির মনে এই সময় কাহিনী বর্ণনার আগ্রহ প্রবল এবং তিনি কবিতাকেই সেই কাহিনী বর্ণনার একমাত্র আধার হিসেবে বেছে নিয়েছেন ও ধীরে ধীরে সেই বর্ণনার রীতিতে বা কৌশলে পক্কতা এসেছে। কৈশোরক পর্বের লেখাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর কবিদের প্রভাব যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি সেই বয়সেই তাঁর কবিধর্মের স্বকীয় প্রতিভার অস্ফুট প্রকাশও দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতাগুলিতে অমিল চতুষ্পদী শ্লোক, ভাব ও ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কবিদের হয়তো তিনি অনুসরণ করেছেন, তবে কোথাও কোথাও বিশেষ শব্দ ব্যবহারে, কোথাও বা দু'একটি চিত্রকল্পে, কোথাও জগৎ-জীবন-প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে, আবার কোনো সময় হৃদয়োচ্ছ্বাস ও স্বপ্নচারিতায় কবির নিজস্ব ভাবধর্ম ও শিল্পকর্মের পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কাহিনী কবিতা রচনার উপযুক্ত আঙ্গিকের সন্ধান তিনি যে এখনো পাননি তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এটিই স্বাভাবিক। কবির বয়স তখন অপরিণত। জগৎ ও জীবনকে তখনও জানতে পারেননি। কবির মনে রয়েছে তাই ভরপুর হৃদয়োচ্ছ্বাস। আর সেই উচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করার মাধ্যম হিসেবেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন উপরোক্ত কাব্যসমূহ ও গাথা কবিতাগুলিকে। তাই আখ্যান বর্ণনার চেয়ে হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করার দিকেই কবির ঝোঁক বেশি ছিল। স্বভাবতই এগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে নায়ক কবির প্রেমের বেদনা। কাব্যগুলির চরিত্রসংখ্যাও অল্প। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে কেবল আবেগ নির্ভর গানের অস্তিত্ব — কোনো কাহিনীসূত্র নেই সেখানে। প্রসঙ্গত, 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের চতুর্থ সর্গের কথা স্মরণ করা যায়। সেখানে কোনো কাহিনী সূত্র নেই, রয়েছে আবেগ নির্ভর আটটি গানের সমবায়। এর দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি বহিরঙ্গের আশ্রয়ে কবি গীতি-কাব্যের রস পরিবেশন করায় মনোযোগী হয়েছেন। আসলে কিশোর কবির জীবনে তখন চলছিল কবি হয়ে ওঠার সাধনা। তাই কাহিনী কবিতা রচনার উপযুক্ত আঙ্গিকটি কি হওয়া উচিৎ সে বিষয়টি কবির ধারণার অতীত ছিল।

দীর্ঘ অনুকরণের পর্যায় তিনি অতিক্রম করলেন 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে পৌঁছে। এই পর্বে এসে কবি নিজেকে নিজে আবিষ্কার করলেন। কবির চিত্ত ছন্দের দিক থেকে, কবিতার বহিরঙ্গের দিক থেকে পূর্বসংস্কার থেকে মুক্তি পেল। তবে 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যের সব কবিতারই মূল সুর হল দুঃখ-বিলাস-অস্পষ্ট বেদনা এবং

সেই অবস্থার সঙ্গেই কবি-চিত্তের সংগ্রাম। তাই 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর কবিতাগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এগুলি ভাবপ্রধান। এর পরবর্তী কাব্য 'প্রভাত সংগীত' সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা চলে। তবে এর ভাবটি ভিন্ন। সে বিশাল হৃদয়-অরণ্যে পথ হারিয়ে 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে কবি বেদনা প্রকাশ করেছেন, 'প্রভাত সংগীত' কাব্যে এসে তিনি সেই পথের সন্ধান পেয়েছেন — যে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর শিশুকালে নিত্য মনের খেলা চলতো, যা যৌবনের উন্মেষ-লগ্নে হৃদয়ের খোরাকের দাবি মেটাতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, তাকেই তিনি আবার ফিরে পেলেন। এই ভাবটি ব্যক্ত করতেই কবি ব্যস্ত 'প্রভাতসংগীত' কাব্যে। কিন্তু ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য যে ভাষা ও ছন্দের নিয়ম ও সংযম দরকার তা কবির আয়ত্ত হয়নি।

এর পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গান' যেন টুকরো টুকরো ছবির মালা। এগুলি নিঃসন্দেহে কবির নব আঙ্গিকের ফসল। কবির শৈশব আর যৌবন যখন একটি বিন্দুতে এসে মিলেছে তখনকার রচনা এই কাব্যটি। তাই স্বভাবতই চিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে বাইরের বিচিত্র দৃশ্যের টুকরো টুকরো গল্প প্রত্যক্ষত হলেও এর ভাষায় রয়েছে ছেলেমানুষি এবং ভাবে এসেছে কৈশোর। তবে দৃষ্টিভঙ্গিমা ও ছন্দ কৌশলের দিক থেকে কবি নতুন ক্ষমতা অর্জন করেছেন বলা চলে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্য হয়তো কবির সার্থক সৃষ্টি নয়, কাহিনীকবিতাও তেমন একটা নেই কিন্তু পরবর্তী 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি'তে; বিশেষত, কাহিনী কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের যে শুচিতা ও সংযম প্রকাশের আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায় তার উন্মেষ ঘটেছে এই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যটিতে।

নিজের কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে কবি সচেতন হলেন 'মানসী' কাব্যে পৌঁছে। এখানকার কাহিনীকবিতাগুলিতে একদিকে যেমন গাল্পিক টেকনিক ব্যবহার করেছেন, তেমনি ভাবগাম্ভীর্যে, অপূর্ব ছন্দসম্পদে ও ব্যঞ্জনাগুণে সেগুলি সমৃদ্ধ। কথার তুলিতে পাঠক চিত্তে কাহিনীর চিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, শব্দ নির্বাচনের দক্ষতা, ধ্বনি ও ছন্দকে ক্রীড়নক করে কাহিনী পরিবেশনের স্বীয় ক্ষমতা এতো সুচারুরূপ বোধ করি পূর্বে পরিলক্ষিত হয় নি। 'মানসী'র 'বধূ', 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতা দুয়ই তার প্রমাণ। গ্রামের উন্মুক্ত চিরপরিচিত পরিবেশ ছেড়ে চার দেওয়ালের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠা শহুরে জীবনের সঙ্গে বধূটি কিছুতে যখন খাপ খাওয়াতে পারেনা, তখন মনে পড়ে তার গ্রামের কথা। 'বধূ' কবিতায় কবি এই গভীর বেদনা ও ব্যঞ্জনা প্রকাশের জন্য যে গাল্পিক-টেকনিক ব্যবহার করলেন তা পূর্বে দেখা যায় নি। কবিতায় বর্ণিত গল্পটি বধূটির স্বগতোক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত। তবে এর মধ্যেও প্রকৃতিকে কবি যুক্ত করেছেন সুচারু রূপে —

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।

(মানসী-'বধূ')

এক্ষেত্রে স্পষ্টত-ই অনুমান করা চলে যে প্রকৃতিকে বর্জন করে কবি কাহিনী রচনা করার চেষ্টা করেন নি। প্রকৃতিও যে কাহিনী রচনার একটি অন্যতম অবলম্বন হওয়া জরুরি, এতে যে কাহিনীর বিষয়ের ব্যঞ্জনা স্পষ্টতর হয়; সে সম্পর্কে কবির শৈল্পিক দৃষ্টি সজাগ ছিল।

এই সময়কালে জমিদারি দেখাশুনার সূত্রে বাইরের প্রকৃতিজগতের সঙ্গে কবির নিবিড় প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলো। প্রকৃতি যে মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, একথা কবি উপলব্ধি করলেন। 'সোনারতরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালি' কাব্যে কবি আপন মনের বন্ধ দুয়ার খুলে প্রকৃতির উদার অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন --- বস্তুময় বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই সঙ্গে সংসারের বিচিত্র লীলা, দৈনন্দিন জীবনের রূপ ও চিত্র কবির চোখে ধরা পড়ল। এই কাব্যগুলির অন্তর্গত কাহিনীকবিতা তথা 'চৈতালি'র গল্পবীজভিত্তিক ছোটো ছোটো কবিতাগুলিতে কবি পরীক্ষামূলকভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, নিসর্গের সঙ্গে মানব-জীবনের রয়েছে অপূর্ব যোগ। নিসর্গের অমোঘ সত্তা আর মানবজীবনের একটি সকরুণ মুহূর্ত তাই নিটোল কাহিনীর আকারে ধরা পড়েছে 'সোনারতরী'র 'যেতে নাহি দিব' এবং 'প্রতীক্ষা' কবিতায়। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার নায়ক তথা ছোট্ট বালিকাটির পিতা যখন বেশ ক'টা দিন ছুটি কাটিয়ে নিজের কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছিল, তখন সেই বিদায় মুহূর্তে স্ত্রী ও কন্যার বিচ্ছেদ ব্যথা বুকে নিয়ে পথে যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল ---

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন --- 'যেতে নাহি দিব' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে
প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে

('সোনার তরী' --- 'যেতে নাহি দিব')

নিসর্গ যে কাহিনীরচনার একটি উপাদান তা এই সময়কার প্রায় সমস্ত কাহিনীমূলক কবিতা ও গল্পবীজভিত্তিক কবিতাগুলি পাঠ করলেই উপলব্ধ হয়। বস্তুত, আবেগময় বর্ণনায়, গাম্ভীর্য পূর্ণ ধ্বনি ব্যবহারে, মনন শক্তিতে, ছন্দগরিমায়, কল্পনার বিচিত্রতায়, বর্ণনার সারল্যে, সর্বোপরি শব্দচয়নে ও সংযমবোধে এই পর্বে রচিত কাহিনী কবিতাগুলি অতুলনীয়। এছাড়াও 'সোনারতরী' কাব্যে কবি যে চারটি রূপকথাভিত্তিক কাহিনী কবিতা রচনা করেছেন সেগুলি হল --- 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' এগুলিতে পংক্তির অন্ত্যমিল বজায় রেখেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কবিতাগুলি গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী হলেও এক্ষেত্রে কাহিনীই প্রধান।

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রুপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা-হাসি।

(সোনার তরী --- 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে')

'চৈতালি' কাব্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি তবে এই প্রচেষ্টা প্রথম দেখা গিয়েছিল 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। 'চৈতালি'র ছোটো ছোটো গল্পবীজ ভিত্তিক কবিতাগুলি পাঠ করলে মানুষ ও প্রকৃতির এক অপূর্ব পূর্ণতার চিত্র পাওয়া যায়। তবে আঙ্গিক ও ভাবপ্রসঙ্গ উভয় দিক থেকেই 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র সঙ্গে 'চৈতালি'র বেশ পার্থক্য রয়েছে। 'সোনার তরী', 'চিত্রা'য় রয়েছে বর্ণনার প্রাচুর্য, 'চৈতালি'তে রয়েছে বাক্-সংযম। তবে লক্ষ্য করার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো আবেগ-সংযম, আবার কখনো বাক্-সংযমের দিকে ঝুঁকেছেন। কাহিনী বর্ণনার এটি এক বিশেষ কৌশল, যা তিনি কবিতায় আরোপ করার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন।

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি-'পরে বসে আছে পা-দুখানি মেলে।
.....
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল নদী-তীরে তীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলে ছুটে চলে আসে
এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।

(চৈতালি --- 'পরিচয়')

কবিতাটি চতুর্দশপদী এবং পংক্তিগুলি অন্ত্য-মিল যুক্ত। অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক এক চিত্রের মাধ্যমে গল্পের ভঙ্গিতে বাক্‌সংযমের দ্বারা কবি এক গভীর তত্ত্ব কথা বলেছেন --- কর্তব্যের কাছে মা ও দিদি উভয় সম্পর্কই সমান এবং স্নেহের ক্ষেত্রে নরশিশু ও পশুশিশুর মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানা যায় না। 'চৈতালি'র কবিতাগুলি সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন --- "এই সব ছবির মধ্যে যাহা আছে তাহা কিছু বর্ণনা,

কিছু গল্প, কিছু বা তত্ত্ব বা নীতিকথা। এই সব গল্প ও বর্ণনা, এমন কি তত্ত্বকথাগুলি পর্যন্ত এত নিরলংকার ও বিরল সৌষ্ঠব, এবং আমাদের অতি-পরিচিত বাংলার নদী, নদীর দুই তীর, কাশবন, ধানক্ষেত, নদীর চর এক কথায় সমতটীয় গাঙ্গেয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন একটি মৃদু সৌরভের, অর্ধ উদাসীন স্মৃতি-চিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, যাহার ফলে আঙ্গিকের তরল শৈথিল্য সত্ত্বেও 'চৈতালি' কাব্যরসিকের পরম সমাদরের যোগ্য।" (রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ৭৮)

'কণিকা'র প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কবিতাই খানিকটা বচন জাতীয়। এগুলিতে অতি সাধারণ ভাষায়, কখনো বা গল্প বলার ভঙ্গিতে দুই অথবা চার পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে তত্ত্বমূলক, উপদেশমূলক ও ব্যঙ্গ-হাস্যমূলক গভীর কথা। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই কবিতাগুলিকে 'লিমারিক' জাতীয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। কবিতাগুলিতে সার্থক কাব্যরসের প্রকাশ নেই। তবে এই ক্ষুদ্রাবয়ব কবিতাগুচ্ছের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের বৃহত্তর কাব্যগুলির অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে মনে করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন "..... তাঁহার বৃহত্তর কাব্যের সহিত ইহাদের অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং ইহাদের বিষয় ভাবপ্রেরণার অভিনবত্বে নয়, আশ্চর্য আঙ্গিকসুষমায়। এই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ স্ফুলিঙ্গসমষ্টির মধ্যে যে শুধু সামগ্রিক কবি-কল্পনার দিব্য দীপ্তি অক্ষুণ্ণ আছে তাহা নয়, সমশীর্ষ, স্থির প্রেরণায় রেখাবন্ধনবলয়িত অগ্নিশিখার গঠনসৌষ্ঠবও এই ক্ষুদ্রতম বিন্দুগুলির মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রতিবিম্বিত।" (রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫)

'কণিকা'র এই ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল বচন-সম ভাববিন্দুর সমষ্টি থেকে কবি-প্রতিভার হঠাৎই অভাবনীয় উত্তরণ লক্ষ্য করা যায় 'কথা ও কাহিনী' কাব্য এবং 'কাহিনী'র নাট্যকাব্যগুলি রচনার ক্ষেত্রে। উল্লিখিত কাব্য ও নাট্যকাব্যগুলির আখ্যানভিত্তিক কবিতাগুলিতে ঘটনার বিবৃতি, পরিমিত বর্ণনা, আবেগ, নাটকীয়তা ও সর্বোপরি কাব্য সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য যে, 'কথা ও কাহিনী' রবীন্দ্রসৃষ্ট প্রথম পূর্ণাঙ্গ আখ্যান-কাব্য। বিচিত্র মনোভাবের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, সূক্ষ্ম সংকেতময় দৃশ্যপট রচনায়, ছন্দপতির মনোরম নিয়ন্ত্রণে এবং অপরূপ ধ্বনি প্রয়োগে 'কথা'র সব কটি আখ্যান কবিতাই অনবদ্য। আবার 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত 'কাহিনী' অংশে স্থান পেয়েছে কতকগুলি দীর্ঘতর আখ্যান কবিতা। 'কথা'য় বর্ণিত ইতিহাসের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীবর্ণনার সুউচ্চ শিখর থেকে হঠাৎ ই অবতরণ করে কবি সাধারণ মানুষের জীবনের কথা বলতে মানুষের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন। 'কাহিনী' কাব্যের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেনের জন্মভূমিপ্রীতি ও তাকে কেন্দ্র করে শোষণ ও বঞ্চনার যে করুণ কাহিনীটি কবি বর্ণনা করেছেন তার ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত সহজ অথচ ব্যঞ্জনাধর্মী। শব্দগুলি এক মুহূর্তে যেন পাঠকের অন্তরের অন্তঃস্থলকে গভীরভাবে নাড়া দেয় ও পাঠককে উপেনের দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। আবার কবিতায় ব্যবহৃত অনুপ্রাসের প্রয়োগ অপূর্ব ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে ---

হেনকালে হায় যমদূত প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব —

.....

বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, "মারিয়া করিব খুন!"

(কাহিনী — 'দুই বিঘা জমি')

এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, প্রথমত, কবি এই পর্যায়ের কাহিনীকবিতা রচনার ক্ষেত্রে যে চরিত্রগুলির কথা বলেছেন সেক্ষেত্রে তিনি যেন চরিত্রগুলিকে বাস্তবে অতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে কাহিনীতে উপস্থাপন করেছেন, তাদের দুঃখ-বেদনা-বঞ্চনার কথা কবি গভীর অনুভূতির সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু কবি এখানে ঐ চরিত্রগুলি বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখতে পেরেছেন। অর্থাৎ কবির ব্যক্তি 'আমি'-র উপস্থিতি সেখানে নেই, যেমনটা ছিল প্রথম যুগের সৃষ্ট কাব্য ও নাট্যকাব্যগুলিতে। সেক্ষেত্রে নায়ক ছিলেন স্বয়ং কবি।

'কাহিনী' কাব্যের 'গানভঙ্গ', 'দীনদান' ইত্যাদি কাহিনীকবিতায় যে রাজাদের কথা উত্থাপিত হয়েছে তাঁরা ইতিহাসের বিশেষ পরিচিত গৌরবের সাক্ষ্যবাহী কোনো রাজা নন, তাঁরা কবি কল্পনার তুলিতে আঁকা চরিত্র। 'গানভঙ্গ' কবিতায় এমনই এক রাজা প্রতাপ রায় সঙ্গীতশিল্পী বরজলালের একজন সহানুভূতিশীল বন্ধু ও সঙ্গীতের রসবোদ্ধা। সুতরাং 'কাহিনী'র আখ্যান কবিতার রাজারা 'কথা'র কবিতাগুলির রাজাদের সমগোত্রীয় নন। শুধু তাই নয়, 'কথা'র রাজাদের ইতিহাসের সত্যতা রয়েছে কিন্তু 'কাহিনী'র রাজারা প্রায় সকলেই কবির মনের রাজ্যের বাসিন্দা। 'কথা'র আখ্যান কবিতাগুলির মাধ্যমে যেন কবি উদাত্ত কণ্ঠে অতীত ইতিহাসের ও ধর্মানুশাসনের মহিমা কীর্তন করেছেন। কিন্তু 'কাহিনী'র সুরটি ভিন্নতর। এখানকার কবিতাগুলি যেন ঘরোয়া জীবনের অশ্রুভারাতুর ও গভীরভাবপ্রকাশক কাহিনীতে পূর্ণ। কবিতাগুলি দীর্ঘ অথচ তাতে ভারে বা ভাষায় কোনো অতিরঞ্জন প্রয়াস নেই। 'কাহিনী'র আখ্যান কবিতার বিষয়বস্তু কাল্পনিক হলেও তা ঐতিহ্যগত অর্থে 'কথা'র আখ্যানগুলির মতোই সেগুলি ভারতীয় চিত্তধর্মিতা প্রকাশক। কাহিনীগুলি বর্ণনার সময় কবি নেমে এসেছেন ধরার ধূলিধূসরিত মানুষের পাশে। সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি কবির সহমর্মিতা ঝরে পড়েছে। কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সুচারু অলংকারবহুল শব্দপ্রয়োগ কবিতাগুলির ব্যঞ্জনাধর্মিতাকে বহুগুণে উচ্চে স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে। 'যত পায় বেত না পায় বেতন' ('পুরাতন ভৃত্য') — এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে উচ্চব্যঞ্জনাধর্মী।

'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলিতে বিভিন্ন স্তবকের কুশলী বিন্যাস ও ছন্দের পারিপাট্য কবির কবিতার আধারে গল্প বর্ণনার এক বিশেষ আটের পরিচয় বহন করে। বিচিত্র মনোভাবের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, সূক্ষ্ম সংকেতময় দৃশ্যপট রচনায়, বিষয় ও ভাবানুযায়ী ছন্দের গতির মনোরম নিয়ন্ত্রণে ও অপরূপ ধ্বনিসংকেতে কাহিনীভিত্তিক কবিতাগুলি অনবদ্য। কবিতায় বর্ণিত গল্পের বিষয়বস্তু, ভাব ও পরিণতি অনুসারে কবি কখনো দ্রুত বা মন্থর

গতির ছন্দ আবার কখনো ভাষার উদাত্ত বা লঘু বিন্যাসরীতি প্রয়োগ করেছেন। 'মস্তক বিক্রয়' কবিতায় কাশীরাজ ও কোশলরাজের যে বিরোধ দেখা যায় তা কীর্তি-প্রতিযোগিতা-সঞ্জাত, এতে কোনো বৈরিতার ঘটনা নেই। কাশীরাজ উদারতার দ্বন্দ্বযুদ্ধে হার মানার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এই সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রেখে কবি কবিতায় করুণরসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও লঘু ও স্মিত কৌতুকময় রসের সৃষ্টি করেছেন। তাই যখন বনবাসী দানী রাজা কোশলরাজ সেই নিরাশ্রয় অসহায় বণিককে সঙ্গে নিয়ে এসে কাশীরাজের সভায় উপস্থিত হয়ে বলেন ---

"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ

দেহো তা মোর সাথিটিরে।"

তখন উপায়ান্তর না পেয়ে কাশীরাজ কিছুক্ষণ মৌন থেকে হেসে বলেন ---

"ওরে বন্দী,

মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে

এমনি বিধিয়াছ ফন্দি!

তোমার সে আশায় হানিব বাজ,

জিনিব আজিকার রণে ---

রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,

হৃদয় দিব তারি সনে।" (কথা --- 'মস্তক বিক্রয়')

একই সঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে কবি এর কাহিনী বর্ণনা করলেও কবি অশ্রুসলিলকে বর্জন করেন নি।

'সামান্য ক্ষতি' কবিতায় রাণীর নিষ্ঠুর খেয়াল-সঞ্জাত অন্যায়ের প্রতিবাদে রাজার রোষাগ্নি ও ন্যায়বিচারের অটল সংকল্প কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দের ওজোগুণে ও অপূর্ব দ্যোতনাময় বর্ণনায় সুচারু রূপে প্রকাশিত হয়েছে ---

কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ

রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে,

"যত দিন তুমি আছ রাজরানী

দীনের কুটিরে দীনের কী হানি

বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি ---

বুঝাব তোমারে নিদয়ে।" (কথা --- 'সামান্য ক্ষতি')

আবার 'বিচারক' কবিতায় দেখা যায় যে পেশোয়া নৃপতি রঘুনাথ রাও যখন 'মৈসুর-পতি-হৈদরালির' বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করে পথে বের হয় তখনকার ভৈরব আয়োজনের বর্ণনা করতে কবি যে ধরনের যুক্তধ্বনিময় শব্দ ব্যবহার করেছেন তাতে কাহিনীর সূক্ষ্ম বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠকের কাছে ধরা পড়েছে —

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা,
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
মারাঠা-নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রভাত-আরবে
বাজে ভৈরবডঙ্ক (কথা — 'বিচারক')

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "'বিচারক'-এর যুক্তধ্বনিময় ছন্দ যুদ্ধের ভৈরব আয়োজন ও ন্যায়দণ্ডের নৈতিক অমোঘতাকে দুই সমান নিক্তিতে ওজন করিয়া উভয়কেই সমগুরুত্ব দিয়াছে।" (রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮)

আবার 'নকলগড়', 'হোরিখেলা', 'বিবাহ' - তিনটি কবিতাতেই লঘু সুরে গুরু বিষয় উপস্থাপন করেছেন কবি। অতি তুচ্ছ সাধারণ কাহিনীর আড়ালে রয়েছে দেশপ্রীতির মহৎ দৃষ্টান্ত ও গভীর ভাব। এগুলিতে ব্যালাডের বর্ণনা ভঙ্গি ও বাচনভঙ্গির চমৎকার কলাকৌশল লক্ষ করা যায়। 'বিবাহ' কবিতায় যে করুণরস কবিগুরু সৃষ্টি করেছেন তা অতুলনীয়।

শিয়র 'পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের 'পরে থুয়ে
নিশীথ রাতে মিলন সজ্জা পরা
[illegible] চিতার 'পরে শুয়ে

কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে একদিকে কবি যেমন স্বদেশপ্রীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন অন্যদিকে করুণরস ও সৃষ্টি করেছেন।

'শেষশিক্ষা' কবিতাটি অন্যান্য কবিতার তুলনায় একটু ভিন্ন স্বাদের। এর আখ্যান বর্ণনায় গীতিধর্মী উচ্ছ্বাস বা ছন্দের পরিপাটি নেই, রয়েছে মন্থর গতির পয়ারের উপস্থিতি। কবিত্ব এখানে সংযত, তবে রয়েছে নাটকীয়তা। শিখ গুরু যখন মামুদকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করেছেন, তখন সেই উক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব নাটকীয়তা

"...... আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোলো তরবার, পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণরক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেমাত্মারে।" (কথা — 'শেষশিক্ষা')

অন্যান্য কবিতায় ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে যে গীতিমাধুর্যের উপস্থিতি দেখা যায় এক্ষেত্রে তার পরিবর্তে রয়েছে নাটকীয়তা। ভাষা প্রয়োগেও ভাব অনুযায়ী গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়েছে।

পাশাপাশি 'কাহিনী'র নাট্যগুণ সম্পন্ন কাহিনী কবিতাগুলির আঙ্গিক বিশ্লেষণ জরুরি। 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' — এই সব ক'টি রচনাই একান্তভাবে গীতধর্মী; অথচ এদের মধ্যে নাটকীয় গুণের অপরূপ সমাবেশ রয়েছে। একমাত্র 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ব্যতীত সব কটি নাট্যকবিতার বিষয়বস্তুগত উপাদান আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে আহৃত। সবকটিতেই কবি প্রচলিত লোকধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানবতার সত্য নিত্য ধর্মের জয় ঘোষণা করেছেন। আলোচ্য পাঁচটি কবিতাতেই কাহিনী উপস্থাপনের জন্য এবং চরিত্রের স্বভাবধর্ম প্রকাশের জন্য কবি সংলাপরীতিকে অবলম্বন করেছেন। 'সতী' কবিতায় অমাবাই-এর পিতা ও মাতার সংলাপে একদিকে যেমন নাটকীয় ভাব প্রকাশ রয়েছে অন্যদিকে চরিত্রগুলির অন্তর্লোক উদ্ঘাটিত হয়েছে —

বিনায়ক রাও ।
অয়ি বৎসে! বৃথা আচার বিচার
পুত্রে লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন
....

রমাবাই
কোথা যাস! ফের
রে পাপিষ্ঠে, ওই দেখ তোর লাগি প্রাণ
যে দিয়েছে রণভূমে তার প্রাণদান
নিষ্ফল হবে না, তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে ধরি তোর মৃত্যুপূত হাতে
শূরস্বর্গমাঝে ....

(কাহিনী - 'সতী')

এছাড়া অন্যান্য নাট্যকাব্যের চরিত্রগুলিতেও (যেমন দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, কুন্তী প্রমুখ) নতুন আলো ফেলে

কাহিনীর বিষয়বস্তু সামান্য পরিবর্তন করে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে কবিগুরু কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। এগুলির মধ্যে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে রচিত একটি দীর্ঘতর কাহিনীকবিতা। এর ভাষা কথ্য, ভাব গৃহস্থালি এবং এক্ষেত্রে কবি ছড়ার ছন্দ (একাবলী) ব্যবহার করেছেন। আঙ্গিকটির বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনে নাট্যকাব্যের প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত রানী কল্যাণীর একটি সংলাপ এই প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হল। দাসী ক্ষীরোর কথার প্রত্যুত্তরে রানী কল্যাণী বলেছেন —

একা বটে তুমি! তোমার সাথি
ভাইপো ভাইঝি নাতনী নাতি —
হাট বসে গেছে সোনার চাঁদের,
দু'টো করে হাত নেই কি তাঁদের?
তোর কথা শুনে কথা না সরে,
হাসি পায় ফের রাগও ধরে

(কাহিনী — 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা')

'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এর শিল্পগৌরবও অতুলনীয়। 'কাহিনী'র নাট্যকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'ভাষা ও ছন্দ'। কবিতাটির যে বিশেষ আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি হল — প্রথমত, কবিতাটির মহাপয়ারযুক্ত অমিত্রাক্ষরধর্মীছন্দ; দ্বিতীয়ত, কবিতায় বর্ণিত অজস্র চিত্রকল্পের মধ্যে ব্যঞ্জনাময় অলংকার প্রয়োগ; তৃতীয়ত, এক ধরনের কল্লোলময় সুগম্ভীর অমিত্রাক্ষর রীতির ধ্বনিপ্রবাহ। এতো সুচারু সমাবেশ বোধ করি কবিগুরুর আর কোনো আখ্যান কবিতায় নেই। এই একটিমাত্র কবিতাই কবির আখ্যান কবিতার জগতে এক অনবদ্য শিল্প সার্থকতা দাবি করে। আলোচ্য কবিতায় বর্ণিত আখ্যানটিতে লক্ষ করা যায় দেবর্ষি নারদ যখন হঠাৎ সন্ধ্যাকালে 'তপোভূমি'তে অবতীর্ণ হলেন, সেই আকস্মিক আবির্ভাবকে কবিগুরু অপূর্বভাষায়, ছন্দে ও চিত্রকল্পের দ্বারা প্রকাশ করেছেন —

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখিদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রমি মধুকরে,
বিস্মিত ব্যাকুল করি, উতরিলা তপোভূমি'পরে।

(কাহিনী-'ভাষা ও ছন্দ')

'কল্পনা'র কবিতাগুলিতে কাব্যরচনার স্টাইল পূববর্তী নিবিড় তত্ত্বানুভূতির আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে এক কল্পনাবিলাসী স্বতঃস্ফূর্ততায় পৌঁছেছে। এর স্টাইলে রয়েছে বিচিত্র রঙের আভাসময় অস্পষ্টতা। তবে 'কল্পনা'তে অতিবিস্তৃত কৌতুকরসের দীর্ঘতর কাহিনী-কবিতা থাকলেও এখানে কবির শিল্পসার্থকতা নিতান্ত

সীমাবদ্ধ।

'কল্পনা'র পরবর্তী কাব্য 'ক্ষণিকা'। কবি বাস্তব সংসারের জীবপ্রকৃতি ও জড় প্রকৃতিকে শুধু চোখ দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে সেই ক্ষণকালের উপলব্ধ আনন্দকে ভাষায় ধরে রেখেছেন এই কাব্যের মাধ্যমে। তাই 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলিতে রয়েছে কবিচেতনার অভিনব মুক্তির ও আনন্দের স্বাদ। কোনো অতীত নয়, বর্তমান নয়, সমস্ত বন্ধন অতিক্রান্ত হয়ে কবি শুধু ক্ষণকালের দণ্ডায়মান ও উপলব্ধ আনন্দকে প্রকাশ করেছেন বলে কাব্যটির ভাষায়, ছন্দে এক নির্বন্ধন বেপরোয়া ভাব প্রতিফলিত। কবিতাগুলিতে অতিসহজ ভাষায় গভীর কথা ব্যক্ত হয়েছে তাই মেঘলা দিনে পাড়াগাঁয়ের মাঠে কালো মেয়েকে দেখে কবিচিত্তে যে অকারণ সুখ জেগেছে তাকে অপরূপ সহজ সাধারণ তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে কাব্যমণ্ডিত ভাষায়, গল্পবলার ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন 'কৃষ্ণকলি' শীর্ষক কবিতাটিতে। সমগ্র রবীন্দ্র কাব্যধারায় আঙ্গিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের ক্রমবিকাশের পথে 'ক্ষণিকা' একটি পরম আশ্চর্য মুহূর্ত। পূর্বের কাব্যরচনারীতিতে যেটুকু আড়ষ্টতা, জড়তা অবশিষ্ট ছিল, 'ক্ষণিকা'র কবিতায় তা অনায়াস সার্থকতা লাভ করেছে।

পরবর্তী 'নৈবেদ্য' কাব্য পাঠককে হঠাৎই এক আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায়। তাই স্বভাবতই এখানে কোনো কাহিনীমূলক কবিতা গড়ে ওঠেনি। 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলি গীতিধর্মী ও সনেট জাতীয়। 'স্মরণ' কবির সদ্যমৃতা পত্নীর উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথা।

'শিশু' কাব্যের কবিতাগুলিতে হঠাৎ কবি এক অপূর্ব প্রাণময় সরলতায় পৌঁছেছেন। শিশুমনের উপযোগী এসব কবিতাগুলির সবই নিরলংকার সরলতায় পরিপূর্ণ। 'মাস্টারবাবু', 'রাঙার বাড়ি', 'পুতুলের সাজ' ইত্যাদি গাল্পিক ঢঙে পরিবেশিত শৈশব কল্পনার রঙে রাঙানো কবিতাগুলিতে কবির ক্রমবর্ধমান নমনীয়তার অর্থাৎ যে কোনো অভিজ্ঞতাকে, কল্পনাকে সহজেই শিল্পরূপ দিতে পারার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য বর্ণনার ভাষা নিতান্তই শিশুমনের উপযোগী সাধারণ ও সরল।

'খেয়া'র কবিতাগুলি অধ্যাত্মরসের ও স্বভাবতই এতে কোনো কাহিনীমূলক কবিতা স্থান পায়নি। কবিতাগুলির প্রকাশভঙ্গির কোন চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যও নজরে পড়ে না। এর পরেই 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' কাব্যে কবি তাঁর অন্তরে উপলব্ধ ভক্তিরস, জীবনদেবতা, সৌন্দর্যমোহকে প্রকাশ করার জন্য বেছে নিয়েছেন এক সুষম, সুনিয়ন্ত্রিত গভীরভাববাঞ্জক শব্দবিশিষ্ট এক অভিনব স্টাইলকে। প্রকাশরূপে রয়েছে স্বতস্ফূর্ততা, গাম্ভীর্য, পংক্তি বিন্যাসে রয়েছে মনোহারিত্ব, রয়েছে উজ্জ্বল আভাসময় কথার সমাবেশ; কিন্তু এই পর্যায়ে কোনো কাহিনীমূলক কবিতা ঠাঁই পায়নি।

রবীন্দ্রনাথ যখনই একটি সুন্দর, পরিপূর্ণ প্রকাশরীতির সন্ধান পেয়েছেন তার সামান্য কিছুদিন পরই তিনি সেটিকে একেবারে পরিত্যাগ করে ভিন্ন মেরুর অভিমুখী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। 'বলাকা'র

সম্পূর্ণ নতুন প্রকাশরীতি লক্ষ্য করলেই কবির এই চিরচঞ্চল পরিবর্তন-পিয়াসী শিল্পী-অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বলাকা' কাব্য রচনাকালে কবি 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' কাব্যত্রয়ীতে আশ্রিত আপন অনুভূতি প্রকাশক সংযত সূক্ষ্ম কাঠামোর পংক্তি বিন্যাসের বন্ধনকে ভেঙে এক উচ্ছ্বসিত বর্ণনাবহুল অনির্দিষ্ট অসমছন্দের পংক্তি রচনায় মনোনিবেশ করলেন। 'বলাকা'র মাত্র কয়েকটি কবিতাই সুনির্দিষ্ট স্তবকে বাঁধা; বাকি প্রায় সবগুলিই অনিশ্চিত দীর্ঘ পংক্তির সমন্বয়ে রচিত। গল্পবীজ ভিত্তিক কবিতা 'ছবি' (৬) 'শাজাহান' (৭) অনির্দিষ্ট দৈর্ঘের পংক্তিগঠিত উৎকৃষ্ট রচনাগুলির অন্যতম। এখানে কবিমনের আবেগ কবির অজ্ঞাতসারেই দীর্ঘ বিস্তারিত রূপ নিয়েছে। তাই ভাষাও এক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের বাহন মাত্র। 'বলাকা'র পঁয়তাল্লিশটি কবিতার বত্রিশটি নতুন এক ছন্দে রচিত। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য হল "এ ছন্দের ঠাট পয়ারেরই, তবে চরণে পর্বসংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। এই ছন্দে অ-সমসংখ্যক পর্বের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ভাবের বাক্ সঞ্চরণ নির্বাধ এবং যথেচ্ছ হইল — সঙ্গীতে গমকের মতো। ইহার ফলে কবিতার ক্ষেত্রপরিধি বাড়িল, এবং পদবন্ধ আরও জোরালো ও ভারবহন সমর্থ হইল।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৮)

পরবর্তী 'পলাতকা' কাব্যের মাধ্যমে কবির কাব্যসৃষ্টির আঙ্গিকে আর একটি নতুন সংযোজনা লক্ষ্য করা গেল। পূর্ববর্তী 'বলাকা' কাব্যে কবি শব্দের গাম্ভীর্যে, ধ্বনিতে সৃষ্ট যে নতুন অসমছন্দের কবিতা রচনা করে নতুন আঙ্গিকের সন্ধান দিলেন, সেই সিঁড়িভাঙ্গা অসম ছন্দই একটু নতুন বেশে দেখা ছিল 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতে। অলংকারবর্জিত একান্ত ঘরোয়া শব্দ ও বাক্য সরল অনাড়ম্বরভাবে কবিতায় উপস্থাপন করে কখনো চিত্রাভাসে, আবার কখনো উপমার দ্বারা কবির অন্তরের অনুভূতি ও উপলব্ধি গুলিকে গল্পের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এই কাব্যে। গল্পগুলির মাঝে কখনো এসে মিশেছে কবির নিসর্গপ্রীতি। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে বিধৃত চরিত্র সৃষ্টিতে কবি অত্যন্ত দরদী ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছেন বাস্তব সংসারে লাঞ্ছিত, অবহেলিত, সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের বঞ্চনায় শিকার-হওয়া নারী চরিত্রগুলির প্রতি 'মুক্তি', 'নিষ্কৃতি', 'ফাঁকি', ইত্যাদি কবিতায় সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি অদ্বিতীয়। স্বল্প কথায় অপূর্ব পরিবেশের বর্ণনা, দু'চার পংক্তিতে মানব-মনের অন্তর্লোকের রহস্য উদ্ঘাটন কবিতাগুলিকে অপূর্ব ঐশ্বর্য দান করেছে। পুরুষশাসিত সমাজে নারী কোন্ যন্ত্রণার মধ্যে জীবনযাপন করে, তার স্বাধীন মত প্রকাশের যে কোনো উপায় থাকে না — এরকমই একটি গল্পকাহিনীকে কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন 'নিষ্কৃতি' কবিতায় মঞ্জুলিকাকে প্রতিনিধি করে। মঞ্জুলিকার জীবনের বঞ্চনার করুণ কাহিনী উপস্থাপন করতে গিয়ে কবি কাহিনীতে তার বাবা, পঞ্চানন, পুলিন ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করেছেন সুচারুরূপে এবং গল্প বলার মাঝেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাদের পরিচয় ও মানসিকতার বর্ণনা দিয়ে কাহিনীকে সুগঠিত করেছেন। পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে এসবই জরুরি, নচেৎ কাহিনীর রসটি পাঠকের হৃদয়ে সুস্পষ্ট রেখাপাত করেনা। এখানে বিষয়ের সঙ্গে ছন্দের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

একদা বাপ দুপুরবেলায় ভোজন সাঙ্গ করে

.....

মা বললেন, বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
''যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্বরে''
আমি কিন্তু পারি যেমন করে
মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে। (পলাতকা — 'নিষ্কৃতি')

বাপ বললেন, কঠিন হেসে, ''তোমরা মায়ে ঝিয়ে একই লগ্নে বিয়ে কোরো আমার মরার পরে, সেই ক'টা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।'' গল্পরচনার প্রয়োজনে একেক সময় কবি ফ্ল্যাসব্যাক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন আবার কখনো অতীতের কিছু কথা বলতে বলতেই হঠাৎ উল্লম্ফন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে বহু বছর পরের কথা বলতে বর্তমানে ফিরিয়ে এনেছেন পাঠককে। এসবই কবির গল্প বলার নতুন আঙ্গিকের স্বাক্ষর। কাহিনীর ভাব ও বিষয়বস্তুই এখানে মুখ্য; তাই কখনো দীর্ঘ প্রলম্বিত পংক্তি, আবার কখনো সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘের পংক্তি ব্যবহার করেছেন। গাল্পিক সুষমা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেকারণেই এই অসংযত পংক্তির ব্যবহার। কবিতার পংক্তিতে যে অন্ত্যমিল একেবারেই নেই তাও নয়; 'কালোমেয়ে' কবিতায় রয়েছে ভাববহনক্ষম অন্ত্যমিলবিশিষ্ট পংক্তির সমাবেশে গল্পকথন —

বছর বছর করে ক্রমে
বয়স উঠছে জমে।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ;
সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ।

'পলাতকা' কাব্য রচনার পর হঠাৎ-ই কবি শিশুমনের গহনে প্রবেশ করে শিশু জীবনকে কেন্দ্র করে গল্পবীজ ভিত্তিক কিছু কবিতা রচনা করলেন — যা শিশু ভোলানাথ কাব্যে গ্রথিত। বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রেখে স্বভাবতই এতে কবি কোনো অলংকারবহুল শব্দ, তৎসম শব্দ ইত্যাদি ভার গম্ভীর শব্দ ব্যবহার না করে শিশুমনের উপযোগী সহজ, সরল, অনাড়ম্বর শব্দ প্রয়োগ করে শিশুমনের বিচিত্র খেয়াল ও কল্পনাকে ভাষার রূপ দিয়েছেন। কবি যেন দূরে দাঁড়িয়ে সুগভীর দরদী মন ও দৃষ্টি দিয়ে শিশুর জীবনের অন্তর্লোকের খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করেছেন। এই কাব্যের কবিতাগুলি প্রায়শ-ই ছড়া জাতীয়।

এরপরই রবীন্দ্রনাথের শিল্পজগতে এসেছে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। কবিগুরুর গদ্যকাব্যের প্রথম পরীক্ষা প্রসূত সৃষ্টি 'লিপিকা' আবির্ভূত হল। 'লিপিকা' গদ্যে লেখা অপূর্ব কাব্য। 'লিপিকা' যে গদ্যে লেখা কাব্য, এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, ''গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ

কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। ... তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি — বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, ৮ম খণ্ড, 'পুনশ্চ'র ভূমিকা)। এর অন্তত প্রথম চোদ্দটি রচনা নিছক কাব্য। এগুলিতে পাওয়া যায় গদ্যছন্দের এক যাদুময় সঞ্চালন, যা সাধারণ কথার ভঙ্গি সম্পূর্ণ বজায় রেখেও অতিগভীর ভাবরাজিকে অপূর্ব ভাবে প্রকাশ করতে পারে। এখানে রয়েছে ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য, ধ্বনির প্রতিধ্বনিময় সমাবেশ এবং অল্প কথায় অপূর্ব ব্যঞ্জনার আভাস। এতে দু'তিনটি কথিকা রয়েছে যেগুলি পরিষ্কার মুক্তছন্দের কবিতা। এছাড়া বেশিরভাগই রূপক-মূলক গদ্যকবিতা, সেগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে কোনো ভাবকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টা। রসসমৃদ্ধ গীতিকবিতার নতুনতর রূপ হিসাবে 'লিপিকা' বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব এক হীরক খণ্ড এতে সন্দেহ নেই।

এরপরই 'পূরবী'তে ধরা পড়েছে পদ্যছন্দের বহু বিচিত্র রূপের প্রকাশ। কবিতার ভাষা গম্ভীর, ভার বহনক্ষম। জীবনের গোধূলি পর্বে উপনীত কবির রচিত এই কবিতাগুলি ব্যথার রঙে রঙিন। তবে ভাষা ও শব্দচয়ন এতো সুচারু যে সেই ব্যথার কোনো চঞ্চলতা বা আবেগ সেগুলিতে প্রকাশ পায়নি। আবার অনেকগুলি তত্ত্বমূলক কবিতায় পাওয়া যায় এক অদ্ভুত দীপ্তিহীন বাক্যবিন্যাস। তবে এক্ষেত্রে কোনো কাহিনীমূলককবিতা রচিত হয়নি। 'মহুয়া'র অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের বিচিত্র লীলার প্রকাশ। অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তি এখানে যে এক ধরনের অপূর্ব ভাব, ছন্দের যাদুময়তা, অবর্ণনীয় এক ইঙ্গিত সৃষ্টি করেছে তা রবীন্দ্রকাব্যে দুর্লভ। 'সাগরিকা' নামক আখ্যানভিত্তিক কবিতায় যেমন রূপকের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তেমনি অতীত ইতিহাসকেও একবার রোমন্থন করেছেন। এর জন্য স্বল্পভাষায় পাঠককে অপূর্ব ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'সাগরিকা'য় ছন্দবিধির প্রয়োগ সার্থক। আবার এই কাব্যের 'নারী' অংশের কাহিনীবীজভিত্তিক কবিতাগুলিতেও ছন্দের প্রয়োগ কবিতাগুলির ভারসাম্য রক্ষা করেছে। সমগ্র কাব্যটির স্টাইলের ভারসাম্যই অতুলনীয়। পরবর্তী 'বনবাণী' কাব্যে 'পূরবী' কাব্যের আঙ্গিক লক্ষণীয়, তবে তার ক্ষেত্র নতুনতর। এখানকার প্রায় সব কবিতাই নিসর্গভিত্তিক — কোনো কাহিনী কবিতা নেই।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল — কবি যেন স্বল্প থেকে স্বল্পতর কথনের দিকে গেছেন; অর্থাৎ দেখা যায় প্রকাশভঙ্গির নিবিড়তা। ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে কবি চূড়ান্ত সংযমী। 'পরিশেষ' কাব্যে তেমন ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে বাহুল্যবর্জিত কতোগুলি কবিতা। এই কাব্যের কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই কবি আত্মবিশ্লেষণ করেছেন। এর জন্য ফিরে গেছেন অতীতে। কবিতার নায়কও স্বয়ং কবি। বিচিত্রা কবিতায় তার স্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে কবি নেমে এসেছেন কঠিন বাস্তব জগতে। কবিতায় তাই আর ব্যক্তিমুখীনতা নেই, রয়েছে বিষয়মুখীনতার প্রাধান্য। আবার এই কাব্যেই রয়েছে আন্তর্জাতিকতার প্রকাশ ('প্রশ্ন')। তবে পরিশেষ কাব্যের কবিতাগুলিতে প্রকাশের অনুজ্জ্বল ধূসরতা দৃষ্ট। এই

আপেক্ষিক দীনতা ঢাকা পড়ে যায় 'পরিশেষ'-এর পর প্রকাশিত 'পুনশ্চ' কাব্যে।

'লিপিকা'র রচনাগুলিতে যে গদ্যকাব্যের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তারই পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল 'পুনশ্চ'তে। 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন — ''অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি ...।'' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কবি ক্রমশঃ বিষয়মুখী কবিতা লিখতে গিয়ে ছন্দকে মুক্তি দিলেন। অতি সাধারণ জীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে গৃহস্থ পাড়ার ভাষার মাধ্যমে। গম্ভীর সাধুভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই এখানকার আখ্যানভিত্তিক কবিতাগুলিতে। কবির ভাষায় -

কোপাই, আজ কবির ছন্দকে সাথি ক'রে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে —
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি (পুনশ্চ — 'কোপাই')

তাই অতি সাধারণ সাঁওতাল পাড়া কবির কলমে এমন প্রাণবন্ত হয়েছে। 'বাঁশি', 'সহযাত্রী', 'শেষ চিঠি', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ছেলেটা', 'বালক' ইত্যাদি প্রায় সব কাহিনীকবিতাই বিষয়মুখী। আমের খোসা, কাঁঠালের ভূতি, মাছের কানকো, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি, অফিসে মাইনে কাটা যাওয়া, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরুর ছেঁড়া ছাতিটা, গাঁয়ের কুকুরটা ইত্যাদি খুঁটিনাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে সম্বল করেই গাল্পিক রূপ দিয়েছেন কবি কবিতাগুলিতে।

কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পংক্তিগুলি কখনো অতি সংক্ষিপ্ত (দু'তিনটি শব্দে গঠিত) আবার কখনো দীর্ঘপ্রলম্বিত। বক্তব্যই এখানে প্রধান। ছন্দের কোনো বন্ধন নেই। ভাব যেখানে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে, সেইখানেই পংক্তির সমাপ্তি। 'বাঁশি' কবিতায় দেখা যায় এর সুস্পষ্ট রূপটি —

ধলেশ্বরীনদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
....
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর। (পুনশ্চ — 'বাঁশি')

জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয় ছন্দবন্ধে নয়, উন্মুক্ত শব্দবন্ধনে কিভাবে ধরা পড়তে পারে তারই

চমৎকার দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। 'শিশুতীর্থ' একটু স্বতন্ত্রধর্মী গদ্যছন্দে রচিত দীর্ঘ কাহিনীকবিতা। তবে কবিতাটি তত্ত্বমূলক ও গভীর ভাবপ্রধান। তাই শব্দচয়নও এক্ষেত্রে গাম্ভীর্যপূর্ণ —

চলেছে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী —
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা
সার্থকতা।
স্পষ্ট করে কিছু বলে না — কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে

'শিশুতীর্থ' কবিতা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যটি স্মরণযোগ্য — "এপিক কল্পনাকে কি করিয়া গীতিকবিতার খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে ধারণ করা যায় তাহার চরমতম পরিচয় মিলিবে 'শিশুতীর্থ' কবিতায়।" (রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ২০৮)

উক্ত দৃষ্টান্তটি নিঃসন্দেহে এই মন্তব্যের অনুসারী। এছাড়া 'ক্যামেলিয়া', 'ভীরু' ইত্যাদি কবিতা নিখুঁত ব্যঙ্গকৌতুক মিশ্রিত গদ্য কথিকা। 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় নায়কটির জীবনের ব্যর্থতার কথা বোঝাতে নায়কের স্বগতোক্তিতে কবি যে কথাগুলি কবিতায় কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে তুলে ধরেছেন তাতে একদিকে যেমন রয়েছে নিখুঁত ব্যঙ্গকৌতুক অন্যদিকে নায়কের জীবনের ব্যর্থ কারুণ্যের ছোঁয়া। গল্পপাঠ করতে করতে যাতে সেই সঙ্গে পাঠকের মনে নায়কটির প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয়, সে কারণেই হয়তো বা এমন শৈল্পিক প্রচেষ্টা —

কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে।
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে —
না সেখানে হাঙর কুমিরের নিমন্ত্রণ, না রাজহাঁসের

তবে এই ব্যঙ্গরস পরিবেশনের জন্য যে সব শব্দ কবিগুরু চয়ন করেছেন সেগুলির ব্যঞ্জনা ও সূক্ষ্মতা পাঠককে বিস্মিত করে।

'পুনশ্চ'র অব্যবহিত পরে রচিত 'বিচিত্রিতা'য় কবি ফিরে গেছেন তাঁর চিরপরিচিত অনায়াসলব্ধ পদ্যছন্দের জগতে। এক গভীর সংকেতময় চিত্রধর্মিতা কবিতাগুলির বিশেষত্ব। কবিতায় চিত্রের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো আড়ষ্টতা লক্ষিত হয় না

'বীথিকা'য় রয়েছে কবির শেষ জীবনের কবিকল্পনার আভাস। প্রত্যেকটি কবিতাই সমিল পদ্যছন্দে রচিত। বিষয়ের দিক থেকে 'বীথিকা'র বৈচিত্র্য মনোরম। বিশ্বজীবন, প্রেম, অনুরাগ, জীবন, মৃত্যু, ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া ও স্বপ্ন, এসব কিছু বিদীর্ণ করে একপ্রকার সুগভীর বিশ্বাস, শান্ত নিস্তব্ধ অনুভব, জীবনের পুরোনো মূল্যবোধ ও আদর্শগুলির এক নতুন মূল্য আবিষ্কারকে বিচিত্র ছন্দে ও বর্ণে কবি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এই কাব্যে বিধৃত কবিতাগুলিতে।

'শেষসপ্তক' কাব্যে আবার 'পুনশ্চ'তে অনুসৃত গদ্যকাব্যরীতি ফিরে এসেছে। এর প্রত্যেকটি কবিতাই খাঁটি গদ্যছন্দে রচিত। 'পুনশ্চ' কাব্য রচনাকালে গদ্যছন্দ প্রয়োগে যে অপরিণতির কিছু কিছু ছাপ --- যেমন ভাবকে অতি বিস্তারের প্রবণতা, বহু ক্ষেত্রে পংক্তিবিভাগের অযৌক্তিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল 'শেষ সপ্তক' কাব্যেও রয়েছে এই দুর্বলতার বিশেষ ধরনটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করার জন্য একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করছি---

সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে। (শেষ সপ্তক --- 'নয়')

এধরণের দৃষ্টান্ত প্রচুর। এখানে পংক্তির শেষের বিরামটি অনাবশ্যক শুধু তাই নয়, সেখানে থামার কথা নয়, সেখানে পাঠকের মনকে ভাবানুসরণের পথে অকারণে থামিয়ে দেয় বলে এই ত্রুটি কাব্যশিল্পের হানি ঘটায়। তবে 'পুনশ্চ'-এর গদ্যছন্দ 'শেষ সপ্তক'-এ আরো পরিণতি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এর আখ্যান বর্ণনার ক্ষেত্রেও কবি জনমানসের অন্তর্জীবনের কথা বলতে বাগ্র। সূক্ষ্ম ভাষার মাধ্যমে গভীর ব্যঞ্জনার আভাস, উপমা, অতীত রোমন্থন ইত্যাদি গাল্পিক গুণগুলি গদ্যছন্দের সহায়তায় কাব্যটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

'পত্রপুট' গদ্যছন্দে রচিত। এখানে গদ্যের সঞ্চালন আরো সুন্দর, আরো ভাবানুগামী এবং ভাষার বুননে এক উজ্জ্বলতর স্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতর ইঙ্গিতময়তা প্রতিভাত। গদ্যছন্দের বহুবিচিত্র গতিভঙ্গিতে এই কাব্যটি মহৎ সৃষ্টের পর্যায়ে উত্তীর্ণ

'পত্রপুট' কাব্যের পরবর্তী 'শ্যামলী'তে কাব্যরচনার ভঙ্গিটি এক বলে মনে হলেও দু'টি কাব্যের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। 'পত্রপুট'-এর কবিতার কল্পনার বিপুল বহিঃপ্রসার ও প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতা তীক্ষ্ণতার বদলে 'শ্যামলী'র আখ্যানভিত্তিক প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে এক করুণ অন্তর্মুখীনতা ও কোমল পেলবতা। 'কনি', 'দুর্বোধ' 'বঞ্চিত', 'অপরপক্ষ' ইত্যাদি কবিতায় দেখা যায় কবি লঘু সুরে অর্ধজাগ্রত কল্পনায় স্তিমিত চেতনায় গল্পবলার ভঙ্গিতে আখ্যান বর্ণনা করেছেন এগুলিতে আখ্যান বর্ণনাই কবির মূল উদ্দেশ্য, প্রেমের রহস্য উদঘাটন নয়। অথচ আখ্যানগুলিতে কোথাও কোথাও প্রেমের স্পর্শ সুস্পষ্ট তবে 'শ্যামলী'র আখ্যানকবিতাগুলির শিল্পমূল্য উচ্চস্তরের।

'খাপছাড়া'র কবিতাগুলি ছোটো ছোটো ছড়া। সেগুলিতে রয়েছে অদ্ভুত রকমের কৌতুকরস। ছড়াগুলির মধ্যে থেকে উঁকি দেয় অসংলগ্ন কিছু গাল্পিকতা। ছড়াগুলিতে ছন্দের বৈচিত্র্য ও উদ্ভট কল্পনা বিচিত্র

রসের সৃষ্টি করেছে। বাহ্যত ছড়াগুলি শিশুদের জন্য রচিত হলেও সেগুলি বালক - বৃদ্ধ সকলেরই উপভোগ্য। তবে এর রস পরিণত মনেরই বেশি উপভোগ্য। ছড়াগুলির ভাব, ভাষা ও ছন্দ অত্যন্ত সহজ-সরল।

'ছড়ার ছবি' কাব্যটির সব কবিতাই ছড়া নয়। অর্থাৎ এগুলির কোনো কোনোটার ধ্বনিতে সুর আছে কিন্তু তার অর্থ দুরূহ। আবার যে কবিতাগুলি থেকে আখ্যানের টুকরো খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলির চিত্রে রয়েছে স্মৃতিচারণা। 'কাঠের সিঙ্গি' 'প্রবাসে', 'পদ্মায়', 'বালক', 'আতার বিচি', 'আকাশ' ইত্যাদি এর অন্যতম। 'পিসনি' কবিতায় পিস্‌নি বুড়ি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে জীবনের পিছনে ফেলে আসা সম্পর্কগুলিকে একবার উল্‌টে পাল্‌টে দেখছে। এইভাবেই এক করুণ আলেখ্য রচিত হয় কবিতায়। এর অর্থ গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী। তবে সব কবিতায়ই পদ্যছন্দের অন্ত্যমিল রয়েছে প্রত্যেক পংক্তিতে।

কবির জীবনান্ত-সম্মুখীন শান্ত চেতনার বিচিত্র উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে 'প্রান্তিক' ও 'সেঁজুতি' কাব্যে। 'প্রান্তিক'-এর প্রায় সব কবিতাই দীর্ঘায়িত পয়ার ছন্দে রচিত। 'সেঁজুতি'র 'তীর্থযাত্রিণী', 'চলতি ছবি', 'ঘর ছাড়া' গল্পগর্ভ ছবি কবিতা। এগুলি 'পুনশ্চ'তে স্থান পাবার যোগ্য। কবিতাগুলির কোনো কোনো ছত্রে ছন্দ প্রয়োগ অভিনব।

'প্রহাসিনী' কাব্যের কবিতাগুলির সবই লঘুছাঁদের। 'আকাশ প্রদীপ'-এর কবিতার ভাষা সরল। 'যাত্রাপথ', 'স্কুলপালানো', 'ধ্বনি', 'বধূ', 'শ্যামা', 'কাঁচা আম' প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে স্মৃতিরোমন্থন। 'বধূ' ও 'শ্যামা' কবিতা দুটি অনবদ্য সুষমাময় সৃষ্টি। এখানে ভাষার মধ্যে জেগে উঠেছে বহু-বাধা-অতিক্রান্ত-এক অপূর্ব স্নিগ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য, অপরূপ ব্যঞ্জনাময় সাবলীল শিল্প গ্রন্থন ও অতি সূক্ষ্ম মৃদু স্পর্শকাতর ইঙ্গিতময় শব্দসমাবেশ ও ধ্বনিচিত্রণ। 'শ্যামা', কবিতার পংক্তি বিন্যাস অভিনব। তবে অন্ত্যমিল এখানেও রক্ষিত হয়েছে। 'প্রশ্ন' ছোট্ট একটি কবিতা। কিন্তু স্বল্প কথা ও ভাষার প্রয়োগে কবিতার ভাবটি অপূর্ব প্রকাশ পায়; যার মর্মে থেকে উঠে আসে একটি চিত্র। 'সময়হারা' একটি আখ্যান-ভিত্তিক কবিতা। কবিতাটি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য হল "প্রাচীন কবিতার ইঙ্গিতবহ এবং ছড়ার বুকনিবিজড়িত 'সময়হারা' পরম উপভোগ্য pastische ধরণের কবিতা।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬১)।

এর ঠিক পরে প্রকাশিত 'নবজাতক' কাব্যে লক্ষ্য করা যায় যে, কবির কাহিনী কবিতার জগতে অভিনব আঙ্গিক সৃষ্টিতে ভাটা পড়েছে। এর প্রকাশভঙ্গিতে কোন চমক নেই। তবে বিষয়বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে নতুনত্ব। কবি নিজের মনন-কল্পনাকে বিস্তৃত করেছেন যে বিষয়গুলিতে, তা একান্তভাবে বর্তমান যুগের — রেলগাড়ি, এরোপ্লেন, রেডিও ইত্যাদি। যে সমস্ত উপমা কবির কল্পনায় এসে ঠাঁই করে নিয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগই আমাদের অতি পরিচিত দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত।

'সানাই' কাব্যের 'বাসাবদল' কবিতাটি পূর্ণাঙ্গ গল্প-কবিতা। 'পরিচয়' ও 'অনসূয়া'তে রয়েছে গল্পের আভাস। 'অনসূয়া' কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় রোমান্টিক বৈশিষ্ট্য।

'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' — জীবনের শেষ বেলায় রচিত এই কাব্যগুলিতে তেমন কোনো আখ্যানভিত্তিক কবিতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে 'আরোগ্য' কাব্যের দু'একটি কবিতায় (৩ ও ৪ সংখ্যক) কবিকে অতীত দিনের স্মৃতিতে অবগাহন করতে দেখা গেছে। তাই কবিতায় ভেসে উঠেছে চিত্রপট, সেগুলি কাহিনীরই উপাদান। কখনো গাজিপুরের, কখনো বা গঙ্গাবক্ষের জ্যোৎস্নারাতের আলেখ্যগুলি যেন কাহিনী বর্ণনারই উপাদান। তবে বক্তব্য প্রকাশের ভাষা গম্ভীর ও সুচারু। 'জন্মদিনে' কাব্যেও আখ্যান বর্ণনা নেই। কবির জীবনের শেষ প্রকাশিত কাব্য 'জন্মদিনে'। এতে এবং কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষলেখা' কাব্যে লক্ষিত হয় মিলহীন পদ্যছন্দে রচিত একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত অচেতন অলংকরণ এবং এক আশ্চর্য অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা। সচেতন শিল্পপ্রয়াস বর্জিত হলেও কবিতাগুলি পরম সার্থকতায় উত্তীর্ণ। তবে কবির বাক্‌সংযমের কারণেই হোক বা আপন খেয়ালবশত ই হোক এক্ষেত্রে কোনো কাহিনীকবিতা সৃষ্টি হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীমূলক কবিতার আঙ্গিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি নজরে পড়ে তা হল আঙ্গিকের বিচিত্র পালাবদল। কবির সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করলে পাঠক মাত্রেই অবগত হবেন যে, কবিমন কখনো একটি নির্দিষ্ট কোটিতে আবদ্ধ থাকেনি। বস্তুত এভাবেই উপলব্ধ হয় রবীন্দ্রকাব্যে সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব এমনটাই ঘটেছে আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও। তাই যখনই কোন বিশেষ ধরনের আঙ্গিকে কবির লেখনি সীমাবদ্ধ হয়েছে তখনই সেই ছন্দ, ভাষা, ভাবের ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে এক বিচিত্র আঙ্গিকের পরীক্ষা করেছেন। ব্যবহার করেছেন সেই ভাবের বাহন রূপে ভাষাকে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে কখনো রূপকাশ্রয়ী, স্মৃতিবাহী, রূপকথাভিত্তিক আবার কখনো ছেলেভুলানো ছড়া জাতীয়, বাস্তব বিষয়মুখী, মানবজীবনমুখী, তত্ত্বভিত্তিক ও ইতিহাসের আদর্শভিত্তিক কাহিনীমূলক কবিতা। কাহিনীমূলক কবিতাগুলির আঙ্গিকের এই বৈচিত্র্য কবিগুরুর প্রতিভার মহৎদান, যা কাহিনীকবিতার ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ